

পীর কামেল

উমেরা আহমেদ
ভাষান্তর: সাদমান সিদ্দীক



ইজরা পাবলিকেশন্স

১.

: ‘আমার জীবনের সবচেয়ে বড় ইচ্ছে?’ বলপয়েন্ট চোঁটে চেপে সে চিন্তায় ডুবে গেল। অতঃপর একটা দীর্ঘশ্বাস নিয়ে কিছুটা অসহায়ের মতো নিঃশব্দে হাসল। তারপর বলল: ‘অনেক কঠিন এর উত্তর দেওয়া।’

: ‘কেন কঠিন?’ জুয়াইরিয়া তাকে জিজ্ঞেস করল।

: কারণ, আমার অনেকগুলো ইচ্ছে আছে। আর সবগুলো ইচ্ছেই আমার কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ।

তারা দুজন অডিটোরিয়ামের শেষ মাথায়, দেয়ালে হেলান দিয়ে ঘাসের গালিচায় বসে ছিল। আজ ছিল তাদের এফএসসি ক্লাসের অষ্টম দিন। আর সে সময় ফাঁকা পিরিয়ডে বসে তারা গল্প করছিল। একটা একটা বাদামের দানা খেতে খেতে জুয়াইরিয়া তাকে পুনরায় জিজ্ঞেস করল: ‘তোমার জীবনের সবচেয়ে বড় ইচ্ছে কী, ইমামা?’

ইমামা কিছুটা হতভম্ব হয়ে তাকে দেখল। এবং ভাবনায় পড়ে গেল। সে উত্তর দেওয়ার পরিবর্তে উলটো প্রশ্ন করে বসল: ‘প্রথমে তুমি বলো, তোমার জীবনের সবচেয়ে বড় ইচ্ছে কী?’

: ‘প্রথমে আমি জিজ্ঞেস করেছি। সুতরাং তোমারই প্রথমে উত্তর দেওয়া উচিত।’ এই বলে জুয়াইরিয়া কাঁধ নাড়ল। ইমামা তৎক্ষণাৎ হার মেনে নিয়ে বলল, ‘আচ্ছা...ঠিক আছে...আমাকে আরেকটু ভাবতে দাও। আমার জীবনের সবচেয়ে বড় ইচ্ছে?’ সে প্রশ্নটি আরেকবার বিড়বিড় করে আওড়াল। ‘একটি ইচ্ছে তো এই যে, আমার জীবনটি হবে অনেক দীর্ঘ।’

: ‘কেন?’ জুয়াইরিয়া হাসল।

: ‘মাত্র পঞ্চাশ-ষাট বছরের জীবন আমার কাছে খুব ছোট মনে হয়। পৃথিবীতে মানুষের তো কমপক্ষে একশো বছর হায়াত পাওয়া উচিত। আর তারপর আমি অনেক কিছুই করতে চাই। যদি খুব জলদিই মারা যাই, তাহলে তো আমার জীবনের সমস্ত ইচ্ছে অপূর্ণ থেকে যাবে।’ সে বাদামের একটি দানা মুখে দিতে দিতে বলল।

: ‘আচ্ছা। আর কী?’ জুয়াইরিয়া বলল।

: ‘আর এটাও যে, আমি দেশের সবচেয়ে বড় একজন ডাক্তার হতে চাই। সবচেয়ে সেরা চক্ষু বিশেষজ্ঞ। আমি চাই, যখন পাকিস্তানে চক্ষু সার্জারির ইতিহাস লেখা হবে, তখন সেখানে আমার নামটি যেন সবার ওপরে থাকে।’ সে মুচকি হাসতে হাসতে আকাশের দিকে তাকাল।

: আচ্ছা, তুমি যদি কখনো ডাক্তার হতে না পারো, তাহলে? কারণ এটা তো সবশেষে মেধা এবং ভাগ্যের ব্যাপার।

: এ অসম্ভব! কারণ, আমি এতটা পরিশ্রম করছি যে, সর্বাবস্থায় মেধাতালিকায় থাকবই। তা ছাড়া আমার বাবা-মায়ের কাছে এত টাকা আছে যে, আমি যদি এখানে কোনো মেডিকেল কলেজে চান্স না-ও পাই, তাহলে তারা আমাকে দেশের বাইরে পাঠিয়ে দেবেন।

: তারপরও যদি কখনো এমন হয় যে, তুমি ডাক্তার হতে পারলে না, তাহলে?

: ‘এ হতেই পারে না। এটা আমার জীবনের সবচেয়ে বড় ইচ্ছে। এটার জন্য আমি সবকিছু ছাড়তে পারি। এটা আমার স্বপ্ন। আর স্বপ্নকে কীভাবে অবহেলা কিংবা ভুলে যাওয়া যেতে পারে! ইম্পসিবল! একদম অসম্ভব!’ ইমামা কঠোর দৃঢ়তায় মাথা নাড়তে নাড়তে হাতে রাখা দানা থেকে আরেকটি দানা মুখে পুরল।

: জীবনে কোনো কিছুই অসম্ভব নয়। যেকোনো সময়, যেকোনো কিছু ঘটে যেতে পারে। এভাবেই ধরো, তুমি ডাক্তার হতে পারলে না, তাহলে? তাহলে তুমি কী করবে? কেমন প্রতিক্রিয়া দেখাবে?

ইমামা এবার চিন্তায় পড়ে গেল।

: প্রথমে তো আমি অনেক কান্নাকাটি করব। অ-নে-ক বেশি...। কয়েক দিন পর্যন্ত...। আর তারপর আমি মরে যাব।

জুয়াইরিয়া অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে হেসে উঠল।

: অথচ একটু আগেই তো তুমি বলছিলে যে, তুমি দীর্ঘ একটি জীবন চাও। আর এখনি তুমি বলছ যে, তুমি মরে যাবে।

: হ্যাঁ; নয়তো আমি বেঁচে থেকে কী করব? আমার সমস্ত পরিকল্পনাই মেডিকেলকে ঘিরে। আর এটাই যদি জীবন থেকে হারিয়ে যায়, তাহলে আর কী বাকি থাকবে?

: অর্থাৎ তোমার একটি বড় ইচ্ছে, অপর আরেকটি বড় ইচ্ছেকে নিঃশেষ করে দেবে?

: মনে করো এটাই।

: তাহলে তো এর অর্থ হচ্ছে, তোমার জীবনের সবচেয়ে বড় হচ্ছে ডাক্তার হওয়া; দীর্ঘ জীবন লাভ করা নয়।

: তুমি বলতে পারো তা।

: ‘আচ্ছা। তুমি যদি ডাক্তার হতে না পারো তাহলে কীভাবে মরবে? আত্মহত্যা করবে, না-কি স্বাভাবিক মৃত্যু?’ জুয়াইরিয়া খুব আগ্রহ নিয়ে জিজ্ঞেস করল।

: ‘স্বাভাবিক মৃত্যুবরণই করব। আত্মহত্যা তো করতেই পারব না।’ উদাসভাবে বলল ইমামা।

: কিন্তু যদি তোমার স্বাভাবিক মৃত্যু না হয়। মানে জলদিই স্বাভাবিক মৃত্যু না আসে, তাহলে তো তুমি ডাক্তার না হয়েও দীর্ঘ জীবন কাটাবে।

: ‘না। আমি জানি। যদি আমি ডাক্তার হতে না পারি তাহলে খুব জলদিই মারা যাব। আমার এত কষ্ট হবে যে, আমি তো বেঁচে থাকতেই পারব না।’ সে আত্মবিশ্বাসের সাথে বলল।

: ‘তুমি যে পরিমাণ হাসিখুশি মেয়ে! আমি তো বিশ্বাসই করতে পারি না, তুমি কখনো এতটা দুঃখী হতে পারো যে, কান্না করতে করতে মারা যাবে। আর এটাও শুধু এজন্য যে, তুমি ডাক্তার হতে পারোনি বলে। হাস্যকর!’ জুয়াইরিয়া এবার তাকে মজা করার ঢঙে বলল।

: ‘তুমি এখন আমার কথা ছাড়া। নিজের সম্পর্কে বলো। তোমার জীবনের সবচেয়ে বড় হচ্ছে কী?’ প্রসঙ্গ পালটে বলল ইমামা।

: থাকা বাদ দাও।

: কেন বাদ দেব? বলো না?

: ‘তোমার খারাপ লাগবে।’ জুয়াইরিয়া দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে বলল। ইমামা ঘাড় ফিরিয়ে অবাক হয়ে তাকে দেখল।

: ‘আমার কেন খারাপ লাগবে?’

জুয়াইরিয়া নিশ্চুপ হয়ে রইল।

: ‘এমন কী কথা যে, আমার খারাপ লাগবে?’ ইমামা নিজের প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করল।

: ‘খারাপ লাগবে।’ মৃদু স্বরে বলল জুয়াইরিয়া।

: ‘অবশেষে তোমার জীবনের সবচেয়ে বড় হচ্ছের সাথে আমার কী সম্পর্ক যে, তাতে আমার খারাপ লাগবে?’ ইমামা এবার কিছুটা বিরক্তি ভাব নিয়ে জিজ্ঞেস করল, ‘কোথাও তোমার এই হচ্ছে নয়তো আবার, আমি যেন ডাক্তার না হই?’ ইমামার হঠাৎ মনে পড়ল। জুয়াইরিয়া হেসে দিল।

: ‘না। জীবনটা শুধু একজন ডাক্তার হওয়ার থেকেও, আরও অনেক বেশি কিছু গুরুত্ব রাখে।’ সে কিছুটা দার্শনিক ভঙ্গিতে বলল।

: ‘হেঁয়ালি বাদ দাও। আর আমাকে বলো। আমি ওয়াদা করছি যে, একটুও মন খারাপ করব না।’ ইমামা তার হাত জুয়াইরিয়ার দিকে বাড়াতে বাড়াতে বলল। জুয়াইরিয়া মুচকি হেসে বলল: ‘ওয়াদা করার পরও তুমি আমার কথা শুনে ভীষণ রাগ করবে। তাই এটাই ভালো হবে, আমরা অন্য কিছু নিয়ে কথা বলি।’

: ‘আচ্ছা, আমি অনুমান করি, তোমার ইচ্ছেটা আমার কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত। রাইট?’ ইমামা কিছুটা ভাবতে ভাবতে বলল। আর জুয়াইরিয়া তার মাথা নাড়ল।

: ‘এখন প্রশ্ন হলো, আমার জন্য কোন জিনিসটা এত গুরুত্বপূর্ণ যে, আমি...।’ সে কথা বলতে বলতে থেমে গেল। ‘কিন্তু যতক্ষণ আমি তোমার ইচ্ছের ধরন সম্পর্কে জানতে না পারব, ততক্ষণ পর্যন্ত কিছুই বলতে পারব না। বলে দাও জুয়াইরিয়া। প্লিজ! এখন তো আমার মন অনেক বেশি অনুসন্ধানী হয়ে যাচ্ছে।’ সে অনুনয় করল।

মাথা নিচু করে জুয়াইরিয়া কিছুক্ষণ ভাবতে থাকল। ইমামা গভীরভাবে তার চেহারার দিকে তাকিয়ে রইল। স্বল্প নীরবতার পর জুয়াইরিয়া মাথা তুলে ইমামার দিকে তাকাল। ইমামা কিছুটা গম্ভীর হয়ে বলল, ‘আমার জীবনের মূল লক্ষ্যটি ছাড়া, আমার কাছে যেসকল জিনিসের খুব গুরুত্ব আছে, তা শুধু একটি। যদি তুমি তা সম্পর্কিত কিছু বলতে চাও, বলতে পারো। আমি একদম মন খারাপ করব না।’

জুয়াইরিয়া কিছুটা আড় চোখে ইমামার দিকে তাকাল। ইমামা তখন তার হাতে থাকা আংটিটি দেখছিল। জুয়াইরিয়া মুচকি হাসল।

: ‘আমার জীবনের সবচেয়ে বড় ইচ্ছে হলো, তুমি...।’ জুয়াইরিয়া তাকে তার ইচ্ছের কথা বলল। ইমামার চেহারা একেবারে সাদা হয়ে গেল। সে শকড় ছিল না-কি হতভম্ব, জুয়াইরিয়া কিছুই বুঝে উঠতে পারল না। কিন্তু তার চেহারার চিত্র নিশ্চিত বলছিল যে, জুয়াইরিয়ার মুখ থেকে নির্গত বাক্যটি তার সমস্ত ধারণার বিপরীত ছিল, যে ধারণাটি ইমামার ভাবনায় কখনো আসেনি।

‘আমি তোমাকে বলেছিলাম না, তোমার খারাপ লাগবে।’ জুয়াইরিয়া যেন নিজেই নির্দোষ প্রমাণের চেষ্টা করল। কিন্তু ইমামা কিছুই বলল না। চুপচাপ তাকে দেখতে থাকল।

২.

মুইজ গলার জোরে চিৎকার করতে করতে দ্বিগুণ ব্যথায় আতর্জনাদ করে উঠল। তার হাতদুটো ছিল তার পেটের ওপর। তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা বারো বছরের ছেলেটি, ছিঁড়ে যাওয়া শার্টের আস্তিন দিয়ে, তার নাক থেকে গড়িয়ে পড়া রক্তের ফোঁটা মুছল। আর হাতে ধরা টেনিস র্যাকেটটি আরও এক বার মুইজের পায়ের ওপর সজোরে মারল। মুইজের গলা চিরে আরও একটা আতর্জনাদ বের হলো। আর এবার সে একদম সোজা হয়ে গেল। তারপর কিছুটা অবিশ্বাস্য চোখে নিজের থেকে দুই বছরের ছোট ভাইটির দিকে তাকাল, যে কোনো রকম ভদ্রতা এবং মানবতা ছাড়াই, নির্দয়ভাবে তাকে ওই র্যাকেট দিয়ে পেট্যাচ্ছিল। যে র্যাকেটটি একটু আগেই তাকে মারার জন্য মুইজই এনেছিল।

এটি ছিল তাদের মধ্যে সংঘটিত এই সপ্তাহের তৃতীয় ঝগড়া। আর তিন বারই ঝগড়া শুরু করেছিল তার ছোট ভাই। মুইজ এবং তার সম্পর্ক ছিল সব সময়ই অসন্তোষজনক। তাদের এই ঝগড়া শৈশব থেকে শুরু করে কিছুক্ষণ পূর্ব পর্যন্ত মুখের ভাষা আর হুমকি-ধমকির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু এখন কিছুক্ষণ ধরে সেই ঝগড়া হাতাহাতিতে নেমে এসেছে।

আজও এমনটাই হয়েছে। তারা একসাথে স্কুল থেকে ফিরছিল। গাড়ি থেকে নামার সময় মুইজ তার ব্যাগ বের করছিল। এমন সময় তার ছোট ভাই পেছনের ডিগ্গি থেকে হ্যাঁচকা টানে তার ব্যাগ বের করে। আর ওই সময় মুইজের হাত চেপে শক্তভাবে মুচড়ে দেয়। মুইজ ব্যথায় কুঁকড়ে উঠে চিৎকার করে: ‘তুই অন্ধ হয়ে গেছিস?’

সে নিশ্চিত্তে তার ব্যাগ উঠিয়ে ভেতরে ঢুকে যেতে যেতে, মুইজের চিৎকার শুনে পেছন ফিরে তাকায়। অতঃপর লাউঞ্জ রুমের দরজা খুলে ভেতরে চলে আসে। মুইজের পুরো শরীরে যেন আগুন ধরে যায়। সে দ্রুতপায়ে তার পেছন পেছন ভেতরে আসে। তার কাছে গিয়ে মুইজ আবারও চিৎকার করে: ‘আবার দ্বিতীয় বার যদি তুই এমন উলটাপালটা করিস, তাহলে আমি তোর হাত ভেঙে দেব।’

চিৎকার শুনে সে কাঁধ থেকে ব্যাগ নামিয়ে, দুহাত কোমরে বেঁধে দাঁড়িয়ে যায়। তারপর পালটা চিৎকার করে বলে: ‘দেখাবি? তুই কী দেখাবি? হাত ভাঙবি? এত সাহস তোর?’

: ‘কী দেখাব, এটা আমি তোকে ওই সময়ই বলব, যখন তুই দ্বিতীয় বার এমন উলটাপালটা করবি।’ এই বলে মুইজ তার রুমের দিকে পা বাড়ায়। কিন্তু তার ছোট ভাই, তার ব্যাগটি পেছন থেকে প্রচণ্ড জোরে টেনে ধরে তাকে দাঁড়িয়ে পড়তে বাধ্য করে।

: ‘না। তুই আমাকে এখনই দেখা, কী দেখাবি!’ সে মুইজের ব্যাগ উঠিয়ে দূরে ছুড়ে মারে। মুইজের চেহারা রাগে লাল হয়ে ওঠে। সে-ও মাটিতে পড়ে থাকা তার ভাইয়ের ব্যাগটিও উঠিয়ে দূরে ছুড়ে মারে। একমুহূর্তেরি না করে তার ছোট ভাই মুইজের পায়ে লাথি বসিয়ে দেয়। প্রত্যুত্তরে সে-ও পুরো শক্তি দিয়ে ছোট ভাইয়ের মুখে একটা ঘুসি বসিয়ে দেয়। সেটা গিয়ে তার নাকে লাগে। কিছুক্ষণের ভেতর তার নাক থেকে গলগল করে রক্ত ঝরতে শুরু করে। এত ভয়ানক আঘাতের পরও তার মুখ থেকে কোনো আওয়াজ বের হয়নি। বরং উলটো সে মুইজের টাই ধরে টানতে টানতে তার গলা চেপে ধরার চেষ্টা করল। প্রত্যুত্তরে মুইজ তার শার্টের কলার ধরে হ্যাঁচকা টান দিল। এতে তার শার্ট ছিঁড়ে যাওয়ার শব্দ হলো। সে পুরো শক্তি দিয়ে তার ছোট ভাইয়ের পিঠে এক ঘুসি মারল। ফলে তার ভাইয়ের হাত থেকে তার টাই ছুটে গেল।

‘দাঁড়া, আমি এখন তোকে তোর হাত ভেঙে দেখাচ্ছি।’ মুইজ তাকে গালি দিতে দিতে লাউঞ্জ রুমের এক কোনায় পড়ে থাকা র্যাকেটটি হাতে নিল। আর নিজের ছোট ভাইকে মারার চেষ্টা করল। কিন্তু একটু পরেই মুইজের ওই র্যাকেটটি ছিল তার ছোট ভাইয়ের হাতে। কারণ, সে সেটা তার থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। আর তারপর সে শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে বিদ্যুৎগতিতে র্যাকেটটি ঘুরিয়ে মুইজের পেটে আঘাত করল। মুইজ কোনো প্রতিরোধ করতে কিংবা নিজেকে বাঁচাতে পারল না। সে একের পর এক মুইজের কোমর আর পায়ে র্যাকেট দিয়ে আঘাত করতেই থাকল। ভেতর থেকে তাদের দুজনের বড় ভাই কামরান রাগে উত্তেজিত হয়ে বের হয়ে এলো।

: ‘কী সমস্যা তোমাদের দুজনের? ঘরে আসতেই হাঙ্গামা শুরু করে দাও!’ তাকে দেখতেই ছোট ভাই ওপরে ওঠানো র্যাকেট নিচে নামিয়ে ফেলল। কামরান এবার ছোটটিকে তিরস্কার করে বলল: ‘আর তুমি...! তোমার লজ্জা করে না নিজের বড় ভাইকে মারতে?’ কামরানের দৃষ্টি এখন তার হাতে থাকা র্যাকেটের দিকে পড়ল।

: ‘না। করে না।’ সে খুব ঔদ্ধত্যের সাথে বলতে বলতে র্যাকেট এক দিকে ছুড়ে মারল। আর তারপর কোনো রকম ডর-ভয় ছাড়াই অদূরে পড়ে থাকা ব্যাগ উঠিয়ে ভেতরে যেতে লাগল। মুইজ তার মার-খাওয়া পায়ে হাত বোলাতে

বোলাতে, উঁচু আওয়াজে সিঁড়িতে উঠতে থাকা ছোট ভাইকে লক্ষ্য করে বলল: ‘তোকে এর মাশুল দিতেই হবে।’

: ‘অবশ্যই। কেন নয়? পরেরবার তুই ব্যাট নিয়ে আসিস। টেনিস র‍্যাকেট দিয়ে পিটিয়ে কোনো মজা পাই নাই। তোর কোনো হাড্ডিও ভাঙে নাই।’ এক শয়তানি মুচকি হাসি দিতে দিতে সে সিঁড়ির শেষ মাথায় দাঁড়িয়ে মুইজকে বলল। এতে মুইজের রাগ চরমে উঠে গেল। সে পালটা উত্তর করল: ‘তুই তোর নাক সামলা আগে। ওটা নিশ্চয় ভেঙে গেছে।’ তারপর মুইজ রাগের মাথায় সিঁড়ির ওই দিকটায় তাকিয়ে রইল, যেখানে একটু আগে তার ছোট ভাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শয়তানি হাসি হাসছিল।

৩.

মিসেস সামান্তা রিচার্ডস ওই ছেলেটির দিকে তাকালেন, যে দ্বিতীয় সারিতে জানালার পাশে প্রথম চেয়ারে বসে আছে। এবার তিনি ওই ছেলেটির দিকে চতুর্থ বারের মতো তীক্ষ্ণভাবে দৃষ্টিপাত করলেন। দেখলেন, সে তখনও খুবই উদাসভাবে, জানালার বাইরে তাকিয়ে আছে। মিসেস সামান্তা তার দিকে তাকালে, সে বাইরে থেকে ক্ষণিকের জন্য দৃষ্টি সরিয়ে উনাকে একপলক দেখত। আর তারপর আবার বাহিরে তাকিয়ে থাকত।

ইসলামাবাদের একটি ইন্টারন্যাশনাল স্কুলে তিনি আজ প্রথম দিন এই ক্লাসে এসেছেন। তিনি বায়োলোজি পড়ান। তিনি একজন ডিপ্লোম্যাটিক-এর স্ত্রী। কেবল কিছুদিন আগেই স্বামীর সাথে ইসলামাবাদে এসেছেন। শিক্ষকতা উনার পেশা। যে যে শহরে উনার স্বামীর পোস্টিং হয়েছিল, তিনি সেখানকার দূতাবাস সংলগ্ন প্রতিটি স্কুলে পড়াতেন। পূর্ববর্তী বায়োলোজি শিক্ষিকা মিসেস মরিয়ম-এর সিলেবাস এবং সময়সূচি ঠিক রেখে, তিনি ক্লাসের সবার সাথে প্রাথমিক পরিচিতি-মূলক সংক্ষিপ্ত কিছু কথাবার্তা বললেন। তারপর তিনি হাট এবং রক্ত চলাচলের নিয়মনীতি-সম্পর্কিত একটি ডায়াগ্রাম বোর্ডে একে একে, তা সবাইকে বোঝাতে লাগলেন।

ডায়াগ্রামের ব্যাখ্যা করতে করতে তিনি ওই ছেলেটিকে জানালা দিয়ে বাহিরে তাকিয়ে থাকতে দেখলেন। তিনি ওই ছেলেটির ওপর দীর্ঘ দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, হঠাৎ লেকচার বন্ধ করে দিলেন। পুরো ক্লাসে তখন নীরবতা ছেয়ে গেল। এটি ছিল উনার পুরোনো এক কৌশল, যা দিয়ে তিনি অমনোযোগী ছাত্রদের

মনোযোগ অর্জন করতেন। এমন নীরবতায় ছেলেটি খানিক ঘাড় ফিরিয়ে ভেতরে তাকাল। আর অমনিই মিসেস সামান্তা রিচার্ডের চোখে তার চোখ পড়ল। মিসেস সামান্তা মুচকি হাসলেন। তারপর আবার তিনি তাঁর লেকচার শুরু করলেন। ধারাবাহিক কিছুক্ষণ লেকচার দেওয়ার পর, তিনি ছেলেটির দিকে আবারও তাকালেন। দেখলেন, সে এখন তার সামনে পড়ে থাকা নোটবুকে কিছু লিখছিল। এরপর মিসেস সামান্তা ক্লাসে উপস্থিত বাকি ছাত্রদের প্রতি মনোযোগী হলেন। উনার ধারণা ছিল, ছেলেটি বেশ লজ্জিত হয়েছে। উপলব্ধিও করতে পেরেছে পরিপূর্ণ। দ্বিতীয় বার আর বাইরে তাকাবে না। কিন্তু মাত্র দুই মিনিট পরই তিনি তাকে জানালা দিয়ে আবারও বাইরে মগ্ন দেখলেন। মিসেস সামান্তা লেকচার দিতে দিতে আরও এক বার মাঝপথে থেমে গেলেন। অনতিবিলম্বে ওই ছেলেটি মাথা ঘুরিয়ে উনার দিকে তাকাল। এইবার মিসেস সামান্তা হাসলেন না। তার দিকে বরং কিছুটা গম্ভীর চোখে তাকিয়ে, দৃষ্টির শাসন করে আবারও লেকচার শুরু করে দিলেন। কয়েক মুহূর্ত অতিবাহিত হওয়ার পর, তিনি পুনরায় ওই ছেলেটির দিকে নজর দিলেন। দেখলেন সে আবারও জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে। এবার স্পষ্টতই মিসেস সামান্তার চেহারা অসন্তুষ্টি প্রকাশ হলো। তিনি কিছুটা অপ্রকৃতিস্থ হয়ে নিশ্চুপ হয়ে গেলেন। তিনি চুপ হতেই ছেলেটি জানালার বাইরে থেকে দৃষ্টি সরিয়ে উনার দিকে তাকাল। এবার ওই ছেলেটির কপালেও কিছু ভাঁজ দেখা গেল। সে মিসেস সামান্তার দিকে নীরসভাবে একপলক তাকিয়েই, আবারও জানালা দিয়ে বাইরে দেখতে লাগল। তার এই কাজটির ধরন এমন তচ্ছল্য-মিশ্রিত ছিল যে, মিসেস সামান্তা রিচার্ডের চেহারা রাগে ও অপমানে লাল হয়ে গেল।

: ‘সালার! তুমি বাইরে কী দেখছ?’ তিনি কঠোর স্বরে জিজ্ঞেস করলেন।

: ‘নাথিং। কিছু না।’ এক শব্দের উত্তর এলো। সে এখন সতর্ক চোখে উনাকে দেখছিল।

: তুমি কি বলতে পারবে, আমি কী পড়াচ্ছি?

: হোপ সো। আশা করি পারব।

সে এতটা অভদ্র ভঙ্গিতে বলল যে, মিসেস সামান্তা রিচার্ড হাতে থাকা মার্কারটি ছিপি দিয়ে বন্ধ করে টেবিলের ওপর ছুড়ে মারলেন। তারপর তিনি চ্যালেঞ্জিং গলায় রাইটিং বোর্ড পরিষ্কার করতে করতে বললেন,

: এই যদি হয় কথা, তাহলে এখানে আসো। ডায়াগ্রামটা এঁকে লেভেল করে দেখাও।

ক্লাসে উপস্থিত ছেলেদের চোখে মুখে একের পর এক, কয়েক ধরনের রং প্রকাশ পেল। তিনি ছাত্রদের বসে বসে একে অপরের সাথে চোখাচোখি করতে দেখলেন। ওই ছেলেটি এখন শান্ত চোখে সামান্তা রিচার্ডকে দেখতে লাগল। যখনই তিনি রাইটিং বোর্ড থেকে শেষ দাগটুকু মুছে ফেললেন, সে তার চেয়ার ছেড়ে এক ঝটকায় উঠে দাঁড়াল। তারপর দ্রুতপায়ে হেঁটে টেবিলে পড়ে থাকা মার্কার হাতে নিয়ে, ঝড়ের গতিতে ডায়াগ্রাম বানাতে শুরু করল। পুরো ২ মিনিট ৫৭ সেকেন্ড পর, সে মার্কারে ছিপি লাগিয়ে ওইভাবেই টেবিলের ওপর ছুড়ে মারল, যেভাবে কিছুক্ষণ আগে সামান্তা রিচার্ড ছুড়ে মেরেছিলেন। তারপর সামান্তা রিচার্ডের দিকে না তাকিয়েই নিজের চেয়ারে এসে বসে পড়ল। মিসেস রিচার্ড তাকে মার্কার ছুড়ে মারতে কিংবা নিজের সিটে ফিরে যেতে দেখেননি। তিনি অবিশ্বাস্য খেয়ালে রাইটিং বোর্ডের দিকে তিন মিনিটের থেকেও কম সময়ে বানানো ওই লেভেলড ডায়াগ্রামের দিকে তাকিয়ে ছিলেন, যেটি বানাতে তিনি দশ মিনিট ব্যয় করেছিলেন। আর সেটি ছিল উনার ডায়াগ্রামের থেকেও বেশি সুন্দর। শত করেও তিনি কোথাও ছোট কোনো ভুল খুঁজে পেলেন না। তিনি কিছুটা হতভম্ব হয়ে, ঘাড় ফিরিয়ে পুনরায় ওই ছেলেটির দিকে তাকালেন। দেখলেন, সে আবারও জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে।

৪.

ওয়াসিম তৃতীয় বার দরজায় টোকা দিল। এবার ভেতর থেকে ইমামার আওয়াজ এলো—

: কে?

ওয়াসিম দরজা থেকে তার হাত সরাতে সরাতে বলল, ‘ইমামা! আমি... দরজা খোলো।’

ভেতরে নীরবতা ছেয়ে গেল।

কিছুক্ষণ পর দরজার লক খোলার শব্দ শোনা গেল। ওয়াসিম দরজার হ্যান্ডেলটা ঘুরিয়ে দরজা খুলে দিল। ইমামা তার দিকে পিঠ করে বিছানার দিকে আগাল। তারপর উলটো পিঠে দাঁড়িয়েই প্রশ্ন করল— ‘আমার কাছে এই সময়ে কী দরকার পড়ল তোমার?’ ওয়াসিম রুমে ঢুকতে ঢুকতে বলল, ‘দরকার তো আছেই। কিন্তু তুমি এত জলদি দরজা বন্ধ করে ফেলেছ কেন? এখন তো মাত্র বাজে দশটা!’

: ‘আমার ঘুম পাচ্ছিল, ব্যস, এজন্য।’ সে বিছানায় বসতে বসতে বলল।

ওয়াসিম তার চেহারা দেখে চমকে গেল।

: ‘তুমি কান্না করছিলে?’ অপ্রত্যাশিতভাবে তার মুখ থেকে বের হয়ে গেল।
ইমামার চোখ তখন লাল হয়ে ফুলে ছিল। আর সে ক্রমাগত ওয়াসিম থেকে দৃষ্টি
আড়াল করার চেষ্টা করছিল।

: ‘না। কান্না করছিলাম না তো। মাথায় একটু ব্যথা হচ্ছিল কেবল।’ ইমামা
হাসার চেষ্টা করল।

ওয়াসিম তার পাশে বসতে বসতে, তার হাত ধরে গায়ের তাপমাত্রা পরিমাপ
করার চেষ্টা করল।

: ‘কোথাও জ্বর আসেনি তো আবার?’ সে কিছুটা চিন্তামিশ্রিত ভঙ্গিতে
বলল। তারপর হাত ছেড়ে দিল। ‘জ্বর তো নেই। তবুও তুমি কোনো ট্যাবলেট
খেয়ে নিতে।’

: খেয়েছি আমি।

: ‘আচ্ছা ঠিক আছে। তুমি ঘুমিয়ে পড়ো। আমি কথা বলতে এসেছিলাম।
কিন্তু এই অবস্থায় কী বলব তোমার সাথে।’ ওয়াসিম রুমের বাইরে পা রাখতে
রাখতে বলল। ইমামা তাকে থামানোর চেষ্টা করল না। সে নিজেও উঠে তার
পেছন পেছন গেল। আর ওয়াসিম বের হতেই সে পুনরায় দরজা বন্ধ করে দিয়ে,
বিছানায় উলটো হয়ে শুয়ে, বালিশে মুখ লুকিয়ে নিল। সে তখন পুনরায় হেঁচকি
তুলে কান্না করছিল।

৫.

তেরো বছরের ছেলেটি ছিল এই মুহূর্তে টিভিতে মিউজিক শো দেখায় ব্যতিব্যস্ত।
তাইয়েবা তখন ভেতরে উঁকি দিলেন। আর অবিশ্বাস্য চোখে নিজের ছেলেকে
দেখলেন। তারপর কিছুটা অসন্তুষ্টি ভাব নিয়ে ভেতরে প্রবেশ করলেন।

: ‘এটা কী হচ্ছে?’ তিনি ভেতরে ঢুকেই বললেন।

: ‘টিভি দেখছি।’ সে টিভি থেকে চোখ সরাল না।

: ‘টিভি দেখছি। ফর গড সেইক! তোমার পরীক্ষা চলছে। সেই খবর আছে?’
তাইয়েবা তার সামনে আসতে আসতে বললেন।

: ‘সো হোয়াট! তাতে কী?’ ওই ছেলেটি এবার কিছুটা ধীরভাবে বলল।

: ‘সো হোয়াট? তোমাকে এই সময় তোমার রুমে বই নিয়ে বসে থাকার কথা; এইসব অনর্থক টিভি শোর সামনে নয়।’ তাইয়েবা ধমক দিলেন।

: ‘আমার যতটুকু পড়া দরকার ছিল পড়ে নিয়েছি। এখন সামনে থেকে সরো।’ তার বলার ভঙ্গিতে এখন অসন্তোষ এসে গিয়েছিল।

: ‘তারপরও ওঠো। ভেতরে গিয়ে পড়তে বসো।’ তাইয়েবা সেভাবেই দাঁড়িয়ে থেকে বললেন।

: না আমি এখান থেকে উঠব, আর না আমি ভেতরে গিয়ে পড়তে বসব। আমার পড়া আর পরীক্ষা এটা আমার বিষয়; তোমার নয়।

: তোমার পড়ার যদি এতই খেয়াল থাকত, তাহলে কি তুমি এখানে বসে থাকতে?

: ‘স্টেপ অ্যাসাইড। সরো এখান থেকে।’ সে তাইয়েবার কথাকে লক্ষ্য করে, অত্যন্ত অভদ্রভাবে হাতের ইশারায় বলল।

: ‘আজ তোমার পাপা আসুক। তাঁকে আমি সব বলব।’ তাইয়েবা তাকে ধমকানোর চেষ্টা করলেন।

: এখনই বলে দাও। কী হবে? পাপা কী করে নেবে আমার? যখন আমি তোমাকে বলেছি যে, আমার যতটুকু প্রস্তুতি নেওয়ার নিয়ে ফেলেছি, তাহলে তারপরও তোমার আপত্তি কীসের?

: ‘এটা তোমার বার্ষিক পরীক্ষা। এটা বোঝা উচিত তোমার।’ তাইয়েবা নিজের স্বরকে একদম নরম করে বললেন।

: আমি কোনো দু-চার বছরের বাচ্চা নই যে, আমার আগে-পিছে তোমাকে ঘুরতে হবে। আমি আমার ব্যাপারে তোমার থেকেও বেশি জানি। এজন্য এই ধরনের থার্ডক্লাস মার্কা কথাবার্তা আমাকে বলতে এসো না যে, পরীক্ষা চলছে, পড়াশোনায় মন দাও। এই সময় তোমাকে তোমার রুমে হওয়া উচিত ইত্যাদি ইত্যাদি। একদম বিরক্তিকর।

: আমি তোমার আব্বুর সাথে কথা বলব।

: ‘হোয়াট অ্যা রাবিশ।’ সে কথা বলতে বলতে রাগে সোফা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে গেল। হাতে থাকা রিমোটটি সে শরীরের পুরো শক্তিতে সামনের দেয়ালে ছুড়ে মারল। তারপর শব্দ করে পা ফেলে ফেলে রুম থেকে বের হয়ে গেল। তাইয়েবা কিছুটা হতাশা এবং অপদস্থতার আবেশে তাকে রুম থেকে বের হয়ে যেতে দেখতে থাকলেন।

৬.

ফ্লোমিনা ফ্রান্স হাতে থাকা প্যাকেটটি টেবিলে রাখতে রাখতে পুরো হলরুমে একটা নজর ফেললেন। পরীক্ষার পেপার দেওয়া শুরু হতে এখনো দশ মিনিট বাকি। হলে বিদ্যমান ছাত্ররা বই, নোট এবং নোটবক্স হাতে নিয়ে খুব দ্রুত পৃষ্ঠা ওলটাতে ওলটাতে উনার দিকে শেষ দৃষ্টিপাত করছিল। তাদের শরীরের ভাষা থেকে পরীক্ষার দুশ্চিন্তা এবং অস্থিরতা প্রকাশ পাচ্ছিল। ফ্লোমিনা ফ্রান্সের জন্য ছিল এটি একটি পরিচিত দৃশ্য। তারপর উনার দৃষ্টি হলের প্রায় মাঝখানে বসা সালারের ওপর গিয়ে থামল। পাঁচিশ জন ছাত্রের মধ্যে সে-ই ছিল একমাত্র ছাত্র, যে নিশ্চিত্তে নিজের আসনে পায়ের ওপর পা তুলে বসে ছিল। তার এক হাতে ছিল স্কেল। স্কেলটিকে সে পালাক্রমে জুতার ওপর বাড়ি মারতে মারতে নিশ্চিত্ত মনে এদিক-সেদিক দেখছিল। ফ্লোমিনার কাছে এই দৃশ্যটিও নতুন কিছু ছিল না। নিজের সাত বছরের ক্যারিয়ারে, পরীক্ষার পেপারের ব্যাপারে তিনি সালারের নিশ্চিত্ত এবং বেখেয়ালি ভাব দেখে আসছিলেন।

সময় তখন নয়টা বেজে দুই মিনিট। তিনি সালারের হাতে তুলে দিলেন এমসিকিউ প্রশ্নের নির্ধারিত অবজেক্টিভ পেপার। ত্রিশ মিনিট পর তার থেকে ওই উত্তরপত্র নেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু নয়টা দশ বাজতেই তিনি সালারকে নিজের চেয়ার ছেড়ে দাঁড়াতে দেখলেন। সে দাঁড়াতেই তার পেছনে বসা হলের সমস্ত ছাত্র, মাথা উঠিয়ে তার দিকে তাকাল। সে উত্তরপত্র হাতে নিয়ে ফ্লোমিনা ফ্রান্সের দিকে যাচ্ছিল। ফ্লোমিনা ফ্রান্সের জন্য এটাও নতুন কোনো দৃশ্য ছিল না। তিনি আগে থেকেই এমন কিছু দেখে আসছিলেন। ত্রিশ মিনিটে সমাধান করার প্রশ্নপত্র, মাত্র আট মিনিটে সমাধান করে, সালার তখন দাঁড়িয়েছিল উনার ঠিক মাথার কাছে।

: ‘উত্তরপত্রটি আরেকবার দেখে নাও।’ তিনি তাকে এ কথাটি বললেন না। কেননা, তিনি জানতেন যে, এর উত্তর হবে—‘আমি দেখেছি।’

তারপরও তিনি যদি তাকে আবারও উত্তরপত্র দেখে নেওয়ার জন্য বাধ্য করতেন, তাহলে সে সব সময়ের মতো উত্তরপত্রটি নিয়ে গিয়ে, চেয়ারের হাতলে রেখে, বাহু বুকুর সাথে জড়িয়ে, নিশ্চিত্তে বসে থাকত। উনার মনে পড়ে না যে, বলার পর কখনো সে তার উত্তরপত্র দ্বিতীয় বার চেক করেছে। আর তিনি এটাও স্বীকার করতেন যে, তার উত্তরপত্র চেক করার কোনো প্রয়োজনও নেই। কেননা, তার উত্তরপত্র হতো একদম নির্ভুল। আর সেজন্য তার উত্তরপত্রে কোনো ভুল খুঁজে বের করা ছিল অনেক জটিল একটি কাজ।

তিনি একটি ধীর মুচকি হাসি দিয়ে, তার হাত থেকে উত্তরপত্রটি নিয়ে নিলেন।

: ‘তুমি জানো সালার! আমার জীবনের সবচেয়ে বড় ইচ্ছে কী?’ তিনি উত্তরপত্রের দিকে তাকাতে তাকাতে বললেন। ‘এটা যে, আমি তোমাকে ত্রিশ মিনিটের প্রশ্নপত্র ত্রিশ মিনিট পর জমা দিতে দেখবা।’

সালার উনার কথায় মুচকি একটা হাসি দিল। তারপর বলল,

: আপনার এই ইচ্ছেটা তখন পূর্ণ হতে পারে ম্যাম! যদি আমি প্রশ্নপত্রটি ১৫০ বছরের বৃদ্ধ বয়সে সমাধান করতে বসি।

: না। আমার তো ধারণা যে, ১৫০ বছর বয়সেও তুমি এই প্রশ্নপত্র দশ মিনিটেই সমাধান করে ফেলবে।

এবার সে হেসে ফেলল। আর তারপর নিজের আসনে ফিরে গেল। ফ্লেমিনা ফ্রান্স এক নজর তার উত্তরপত্রের পৃষ্ঠাগুলো উলটে-পালটে দেখলেন। এমন একটি হালকা নজরও তাঁকে এটা বলার জন্য যথেষ্ট ছিল যে, সে ওই উত্তরপত্রে কত নাম্বার কম পাবে ‘জিরো।’

৭.

সালমা আহমদ তাঁর মেয়ের হাতে গিফট-পেপারে মোড়ানো প্যাকেটটির দিকে অবাক চোখে তাকালেন।

: এটা কী ইমামা? তুমি তো মার্কেটে গিয়েছিলে। আর সম্ভবত কিছু বই কেনার ছিল তোমার।

: হ্যাঁ আন্নি। আমার বইই কেনার ছিল। কিন্তু কাউকে উপহার দেওয়ার জন্য।

: কাকে উপহার দেবে?

: লাহোরে আমার এক বান্ধবী আছে। সামনে তার জন্মদিন। তার জন্যই কিনেছি এগুলো। কুরিয়ার সার্ভিসে পাঠিয়ে দেব। কারণ, আমি তো এখন লাহোর যাব না। ছুটিতে তো এখন এখানেই থাকতে হবে।

: ওটা এদিকে আনো। প্যাকেটটা আমার কাছে দাও। আমি ওয়াসিমকে দিয়ে দেব। সে-ই পাঠিয়ে দেবে।

: না আন্নি। আমি এখনই পাঠাব না। এখনো তার জন্মদিনের তারিখ আসেনি।

সালমার মনে হলো ইমামা একদম ঘাবড়ে গিয়েছে। তিনি অবাক হলেন। এটা কি ঘাবড়ে যাওয়ার মতো কোনো বিষয় ছিল?

তিন বছর আগে ইমামার জন্য অনেক দুশ্চিন্তার মুখোমুখি হতে হয়েছিল, তাঁর এবং তাঁর স্বামী হাশেম মুবিনের। তিনি তখন তাঁর মেয়েকে নিয়ে অনেক চিন্তিত ছিলেন। আর হাশেম মুবিন ছিলেন তাঁর থেকেও বেশি চিন্তিত। কিন্তু গত তিন বছরে সবকিছু ঠিক হয়ে গিয়েছিল। তাঁরা দুজনেই এখন তার দিক থেকে ছিলেন পরিপূর্ণভাবে নিশ্চিত। বিশেষ করে আসজাদের সাথে তার বিয়ে ঠিক করে দিয়ে। তিনি জানতেন ইমামা আসজাদকে পছন্দ করে। শুধু সে-ই নয়; আসজাদকে যেকেউ দেখলেই পছন্দ করত। কারণ, সে সবদিক থেকেই ছিল একটি আদর্শ ছেলে। তিনি এ-ও জানতেন যে, আসজাদের সাথে বিয়ে ঠিক হওয়ায় সে খুব খুশিও হয়েছিল। আসজাদ এবং তার মাঝে আগে থেকেই খুব ভালো বন্ধুত্ব এবং অন্তরঙ্গতা ছিল। কিন্তু মাঝেমধ্যে উনার মনে হতো, সময়ের সাথে সাথে ইমামা ক্রমশ নিশ্চুপ হয়ে যাচ্ছিল। সে প্রথমে এমন ছিল না। ‘কিন্তু এখন সে তো আর স্কুলে যাওয়া বাচ্চাটিও নেই। মেডিকেল কলেজের স্টুডেন্ট। সুতরাং সময়ই-বা কোথায় থাকবে তার কাছো’ এসব বলে সালমা আহমদ সব সময় নিজেকে বুঝিয়ে নিতেন।

ইমামা ছিল তাঁদের সবচেয়ে ছোট মেয়ে। বড় দুই মেয়ের বিয়ে দিয়ে দিয়েছেন। দুই ছেলে আর ইমামার বিয়ের বাকি থাকতে, এক ছেলেকেও বিয়ে করিয়ে ফেলেছেন। ‘ভালোই। মেয়েটা গভীর হচ্ছে দিনদিন। মেয়েদের জন্য গান্ধীর্ষ অনেক ভালো জিনিস। তাদের যত জলদি নিজের দায়িত্বের প্রতি বোধ জন্মাবে, ততই ভালো।’ সালমা আহমদ একটা গভীর শ্বাস নিতে নিতে ইমামার থেকে চোখ সরিয়ে নিলেন। ইমামা ছুটিতে বাড়িতে আসত। আর যত দিন সে এখানে থাকত, তত দিন ইমামার ওপর তাঁর নজর থাকত—সজাগ, সচেতন।

‘কী জানি, এই সাজিদটা কোথায় রয়ে গেছে! যে কাজই তাকে করত বলো, ব্যস ভুলেই যাবে সে।’ উনার হঠাৎ করে কাজের লোকটার কথা মনে পড়ল। যার পেছন পেছন তিনি লাউঞ্জ এসেছিলেন। বিড়বিড় করতে করতে তিনিও এবার লাউঞ্জ থেকে বের হয়ে গেলেন।

৮.

ওটা ছিল নিউ ইয়ার নাইট। নতুন বছর শুরু হতে আর তিন মিনিট বাকি। চৌদ্দ-পনেরো বছরের দশ জন ছেলের ওই দল, বিগত দুই ঘণ্টা ধরে নিজ নিজ মোটর সাইকেলে করে, শহরের বিভিন্ন রাস্তায় নিজেদের কৃতিত্ব দেখানোয় ছিল ব্যস্ত। তাদের মধ্যে কয়েক জনের মাথায় বাঁধা ছিল চমকদার ব্যাজ। যেখানে নববর্ষকে ঘিরে কিছু বাক্য লেখা ছিল। এক ঘণ্টা আগে তারা পুশ এলাকার একটি বড় সুপার মার্কেট অতিক্রম করছিল। আর তখন তারা সেখানে থাকা মেয়েদের দেখে শিস বাজাচ্ছিল। নিজেদের বাইকে চড়ে বিভিন্ন সড়কে চক্কর দিচ্ছিল। তাদের পকেটে ছিল পটাকা। যেগুলো তারা একটু পরপর ফটাফট ফোটাচ্ছিল। পৌনে বারোটায় তারা জিমখানা ক্লাবে এসে উপস্থিত হলো। ওখানকার পার্কিং লট ছিল অসংখ্য গাড়িতে ঠাসা। এই গাড়িগুলো ছিল ওই লোকদের, যারা জিমখানায় ‘নিউ ইয়ার’ উদ্‌যাপনের জন্য অনুষ্ঠাতব্য পার্টিতে এসেছিল। ওই ছেলেগুলোর কাছেও ছিল পার্টির ইনভাইটেশন কার্ড। কেননা, তাদের মধ্য থেকে প্রায় সবার বাবা-মা-ই ছিল জিমখানার সদস্য।

ওই ছেলেগুলো ভেতরে পৌঁছল। তখন সময় ১১ টা বেজে ৫৫ মিনিট। কয়েক মিনিট পর হলরুম এবং ডান্স ফ্লোরের সমস্ত লাইট অফ হয়ে যাবে। আর তারপর বাইরের লনে আতশবাজি প্রদর্শনের সাথে, নতুন বছর শুরু করে লাইট অন করা হবে। তারপর প্রায় পুরো রাতজুড়ে ওখানে নৃত্যের সাথে সাথে চলবে মদপানের মহড়া। ‘নিউ ইয়ার’ অনুষ্ঠানের জন্য জিমখানার ব্যবস্থাপকরা বিশেষভাবে যে মদপানের আয়োজন করতেন, সেটি লাইট অফ হতেই সেখানে প্রতিবছর উচ্ছৃঙ্খলতার এক তাণ্ডব শুরু হয়ে যেত। ওখানে উপস্থিত লোকগুলো মূলত, ওই ‘উচ্ছৃঙ্খলতার তাণ্ডবে’র জন্যই সেখানে এসেছিল।

পনেরো বছরের ওই ছেলেটিও, দশ জনের ওই গ্রুপের সাথে এসেছিল। ওই মুহূর্তে সে ডান্স ফ্লোরের ওপর তুমুল ডান্স করছিল। ডান্সে তার দক্ষতা ছিল দেখার মতো।

বারোটা বাজতে দশ সেকেন্ড বাকি থাকতেই সমস্ত লাইট অফ হয়ে গেল। এবং ঠিক বারোটায় লাইটগুলো জ্বলে উঠল। অন্ধকার হওয়ার পর সেকেন্ড গণনাকারীদের আওয়াজ এখন হই-হুল্লোড়, আনন্দের অউহাসি এবং চিৎকার-